আবৃত্তির ছড়া
আবৃত্তির কবিতা

সম্পাদনা
প্রণতি ঠাকুর
হান্‌নান আহসান

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

আমাদের ছোটোবেলায় পাড়ায় পাড়ায় আবৃত্তির ধুম ছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা সুকান্তের জন্মজয়ন্তীতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হতো। রাস্তার মোড়ে, হাটের পাশে, ক্লাব-অঙ্গনে এইসব কম্পিটিশনে দূর-দুরান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা আসতো। মাইক বাজিয়ে সারাদিন চলতো অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছামতী, তালগাছ, প্রশ্ন, ছোটো নদী অথবা পুরাতন ভৃত্য কবিতাগুলি কোন না কোন প্রতিযোগিতার বিষয় হতো। তেমনি, নজরুলের খুকী ও কাঠ্‌বেড়ালি, লিচু চোর, প্রভাতী, কান্ডারী হুঁশিয়ার। পাশাপাশি সুকান্তের আঠারো বছর বয়স, একটি মোরগের কাহিনী, ভাল খাবার কবিতাগুলিও ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অতীব প্রিয়।

আমরা যখন বেড়ে উঠছি, কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করছি—পাড়ায় পাড়ায় শিল্প-সংস্কৃতির পরিবেশ ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে। মানুষ ক্রমশ বদলাচ্ছে। অনুষ্ঠানের যত্রতত্র আয়োজন যাচ্ছে কমে। পরিবর্তে সাংস্কৃতিক হুল্লোড়পনা, দাপাদাপির পরিবেশ জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা করছে। লতা-কণ্ঠী, কিশোর-কণ্ঠী নাইটের মোড়কে সারারাত নাচ-গানের জমাটি জলসা শুরু হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এইসব জলসা-নাইটে বাংলা গানের আধিক্য কমেছে। মাটির ভাষা হয়েছে ম্যাড়মেড়ে। হিড়িকে যুক্ত হয়েছে জীবনমুখী গান, পরে ব্যান্ডের গান। জীবনমুখী গান দীর্ঘস্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। শ্রোতা আকৃষ্ট হলো ব্যান্ডের গানে। কিন্তু সুর-তাল-লয়ের বাঁধনহীন এই সঙ্গীতগুলিও হয়তো কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, হিন্দী গানের ধুমধাড়াক্কা বর্তমানের সবচেয়ে প্রাণবন্ত বিষয়, তরুণ ও তরুণতরো সমাজের কাছে।

লক্ষ্যণীয় বিষয়, এককালে আবৃত্তির যে চর্চা ছিল, একুশ শতকে পৌঁছে তা বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, মফঃস্বলে আবৃত্তি শিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কেবল বাংলা আকাদেমি বা জীবনানন্দ সভাঘর নয়, জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভবন-মঞ্চে নিয়মিত আবৃত্তি-অনুষ্ঠান চলছে। আজকের এই জনপ্রিয়তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। মধুসূদন দত্ত, গিরীশচন্দ্র ঘোষ আবৃত্তি পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের আবৃত্তি আমরা সবাই শুনেছি। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও আবৃত্তি প্রিয় ছিল। আর কাজী সব্যসাচী, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখের আবৃত্তি ইতিহাস হয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ মিত্র, মধুবন্তী মৈত্ররা এবং হাল আমলে শুধুমাত্র আবৃত্তি করে অনেকেই পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছেন। বাচিক শিল্পকে শিল্পীত স্তরে উন্নীত করে চলেছেন একালের এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী। তাদের শুভ প্রচেষ্টায় আবৃত্তি জনপ্রিয় হচ্ছে নিঃসন্দেহে।

দিকে দিকে আবৃত্তি চর্চা চলছে, প্রচার ও প্রসারের মাত্রা বাড়ছে। বেতার ও দূরদর্শন তো বটেই, বিভিন্ন বাংলা টিভি চ্যানেলগুলিও আবৃত্তি অনুষ্ঠান গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করছে। কিন্তু আবৃত্তির সঙ্গে ভালো কবিতা বা ছড়া নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। সব কবিতা বা ছড়া আবৃত্তি উপযোগী নয়। গুটি কয়েক আবৃত্তির বই বাজারে রয়েছে। সেগুলি বড্ড এলোমেলো,

পারম্পর্যহীন। একই কবিতা বারংবার ছেপে বইগুলি চর্বিতচর্বন করছে। বৈচিত্র্য ও সঠিক কবিতা নির্বাচনে খামতি রয়ে গেছে। বইগুলির পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রিয় কবিতার অভাব অনুভূত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল বইগুলির। তা হয়নি, আর এই হয়নি বলেই আনুষঙ্গিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সেইসব ছোটো ছোটো ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে 'আবৃত্তির ছড়া আবৃত্তির কবিতা' সংকলনটির অবতারণা। ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিকতম কবিদের সম্ভবত সেরা কবিতা ও ছড়া নিয়ে সংকলনটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

'আবৃত্তির ছড়া আবৃত্তির কবিতা' গ্রন্থটি চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'প্রাচীন ছড়া' অংশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ছোটোদের কাছে। মুখে যাদের সবে কথা ফুটেছে, তাদের জন্য এই পাঠটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়েছে। আট বছর যাদের বয়স, তাদের জন্যও পরিবেশিত হয়েছে উপাদেয় ছড়া ও কবিতা। পরের দুটি পাঠ নয় থেকে চোদ্দ এবং পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সীদের জন্য। শেষ পাঠে সব বয়সের সবার জন্য রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। আবৃত্তি উপযোগী সেরা লেখাগুলিই একত্রিত করা গেছে, বলতে অসুবিধে নেই। সংকলনের বাইরেও বহু ভালো ছড়া-কবিতা নিশ্চয়ই রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দামের সাযুজ্য বজায় রাখতে একটা জায়গায় থামতে হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের মেলবন্ধন ঘটতে পারে। সামগ্রিকভাবে এই সংকলনে গ্রন্থিত ছড়া-কবিতাগুলি বাচিক শিল্পীদের প্রয়োজনে একটি পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হবে আশা করা যায়।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় সাম্প্রতিককালে ছড়া-কবিতার শরীর নিয়ে উপাদেয় কিছু লেখা লিখেছেন। আবৃত্তি কীভাবে সুচারু হয়ে উঠতে পারে, তিনি কাটাছেঁড়া করে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি একটি সুন্দর অর্থবহ রচনা এখানে ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। আবৃত্তির সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণের সম্পর্ক রয়েছে। হীরেন চট্টোপাধ্যায় উচ্চারণের সাত সতেরো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ক্ষুদে পাঠকদের জন্য এই রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। 'কণ্ঠস্বর ভাল রাখতে যা মনে রাখা দরকার' শীর্ষক আর একটি মূল্যবান রচনা লিখে দিয়েছেন যশস্বী চিকিৎসক ও সুলেখক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। আশাকরি, তাঁদের লেখা দুটি নবীন আবৃত্তি- শিল্পীদের কাজে আসবে।

পাশাপাশি আরও দু'জন প্রিয় মানুষের প্রসঙ্গ সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই। তাঁদের একজন সাহিত্যিক তপনকুমার দাস এবং অন্যজন পুনশ্চ-র কর্ণধার সন্দীপ নায়ক। প্রতিনিয়ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন বন্ধুবর তপনকুমার দাস। সংকলনটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করায় সন্দীপ নায়কের কাছে কৃতজ্ঞ। বর্ষীয়ান শিশুসাহিত্যিক অশোককুমার মিত্র সংকলনটির পরিচর্যায় সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে প্রচ্ছদ শিল্পী, ডিটিপি ও মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, 'আবৃত্তির ছড়া আবৃত্তির কবিতা' গ্রন্থটি যাদের জন্য, তাদের উপকারে লাগলে খুশি হবো। ভুল-ত্রুটি এবং সংকলনটিতে আর কী কী অভাব অনুভূত হচ্ছে, সে সব লিখে প্রকাশককে জানানোর আমন্ত্রণ রইলো সকলের কাছে।

জানুয়ারি, ২০০৯
কলকাতা

প্রণতি ঠাকুর
হান্নান আহসান

সূচিপত্র

বিষয় ঃ আবৃত্তি

উচ্চারণই আসল কথা : হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২১
কণ্ঠস্বর ভালো রাখতে যা মনে রাখা দরকার : শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫

প্রাচীন ছড়া

আতা গাছে তোতা পাখি ৩৩
দোল দোল দুলুনি ৩৩
আগডুম বাগডুম ৩৩
আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল ৩৪
মাসি পিসি বনগাঁবাসী ৩৪
খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো ৩৫
আমপাতা জোড়া জোড়া ৩৫
আয় রে আয় টিয়ে ৩৬
নোটন নোটন পায়রাগুলি ৩৬
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ৩৭
আইকম ভাইকম তাড়াতুড়ি ৩৭
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ৩৮
আয় আয় চাঁদা মামা ৩৮
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ৩৯
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি ৩৯
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে ৪০
ওপারেতে কালো রং ৪০
ওপারেতে তিল গাছটি ৪১
আলুর পাতা থালুরে ভাই ৪১
যমুনাবতী সরস্বতী ৪২

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড় ৪২
আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি ৪৩
কানকাটার মা বুড়ি ৪৩
আমরা দুটি ভাই ৪৪
এক যে আছে একানোড়ে ৪৪
খোকা যাবে মাছ ধরতে ৪৪
উলু উলু মাদারের ফুল ৪৫
ওখানে কে রে ৪৫
আজ খোকনের অধিবাস ৪৬
দিদি লো দিদি ৪৬
আমার কথাটি ফুরলো ৪৭

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে আটে

প্রভাত — মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৫১
প্রভাত — দীনবন্ধু মিত্র ৫১
বড়ো কে — হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৫৩
কাজের লোক — নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫৩
ছোটো নদী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪
ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫
হাট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫
অল্পেতে খুসি হবে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬
বাবুই পাখিরে ডাকি — রজনীকান্ত সেন ৫৭
আমার পণ — অজ্ঞাত ৫৮
রানি রাঁধুনী — চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
চাঁদের হাট — দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৫৯
বিষ্টি পড়ে — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৯
ঠাণ্ডার গল্প — গিরিজাকুমার বসু ৬০
আয়রে পাখি — কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬০
কোন্ দেশে — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬১
ভয় পেয়ো না — সুকুমার রায় ৬২
গোঁফ্ চুরি — সুকুমার রায় ৬৩
ভালবাসি — তমাললতা বসু ৬৪
কাকাতুয়া — যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৬৫

মজার মুল্লুক	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৬৬
নিচু-চোর	কাজী নজরুল ইসলাম	৬৭
ঘুম-জাগানো পাখি	কাজী নজরুল ইসলাম	৬৮
প্রভাতী	কাজী নজরুল ইসলাম	৬৯
ছুটি ! ছুটি ! ছুটি !	অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)	৭০
ছড়া	সুনির্মল বসু	৭১
নাটোরে	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১
ভোজ পুরাণে লিখেছিল	ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২
আবদার	ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
আমার বাড়ি	জসীমউদ্দিন	৭৩
খেলার মাঠে	অন্নদাশঙ্কর রায়	৭৪
আমাদের গ্রাম	বন্দে আলী মিঞা	৭৪
খোকন-মণি	প্রভাবতী দেবী	৭৫
আসল কথা	অজিত দত্ত	৭৬
আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	৭৭
তাধিন তাধিন	অমিতাভ চৌধুরী	৭৭
দশমুণ্ডি ছড়া	অমিতাভ চৌধুরী	৭৮
শীতের ভোরে	পান্নালাল ঘোষ	৭৮
পারাপার	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৭৯
চাচার ছ্যাকড়া গাড়ি	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯
হাওয়া বয়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৮০
রাজা আর সেপাই	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৮১
হুলো বেড়াল	পূর্ণেন্দু পত্রী	৮২
ঝালের পিঠা	আল মাহমুদ	৮৩
পাখির মতো	আল মাহমুদ	৮৩
নোলক	আল মাহমুদ	৮৪
শহর ছেড়ে আইলাম	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৮৫
বকুনি	শঙ্খ ঘোষ	৮৬
উলুকঝুলুক	শঙ্খ ঘোষ	৮৬
বান	শঙ্খ ঘোষ	৮৭
আঁকতে পারি	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	৮৮
দুর্গা আসে	সরল দে	৮৯
জুতো পালিশ	সরল দে	৮৯

উচ্চারণই আসল কথা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

নিয়মিত সময় অন্তর ঝোঁক পড়াটাই হল বাংলা ছন্দের প্রধান কথা। বাংলা ছন্দের বললাম দুটো কারণে। প্রথম কারণটা হল অন্যান্য ভাষার ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটা তফাত তো আছে, সেইখানেই আছে ছন্দের প্রাণশক্তি, কাজেই তাকে চিনতে গেলে এই শক্তিটার কথা ভুললে চলবে না কখনোই। যদি কখনো কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তো শরণাপন্ন হতে হবে সেই মূল ব্যাপারটার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যটা জানা থাকলে তাকে চেনার ক্ষেত্রে যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় মনে হবে না, সেগুলো আমরা বাদ দিতেও পারব।

অন্যান্য ভাষার ছন্দ বলতে আমাদের চেনাজানা গণ্ডির মধ্যে দুটো ভাষাই আছে—সংস্কৃত আর ইংরেজি। সংস্কৃতভাষার উচ্চারণে লঘু অক্ষর এবং গুরু অক্ষরের তফাতটা মেনে চলা হয় অত্যন্ত ভালোভাবে। লঘু অক্ষর যতটা সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়, গুরু অক্ষর উচ্চারণ করা হয় তার দু-গুণ সময় নিয়ে। কাজেই সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অক্ষরের বিন্যাস। বাংলায় সেই ব্যাপারটাই নেই, নেই বলেই এত বানান ভুল হয় আমাদের। যখন বলি 'নূপুর' তখন কখনোই উচ্চারণ করি না 'নূ-পুর', বা যখন বলি 'শারীরিক' তখন উচ্চারণটা 'শা—রী—রিক' হয় না। সংস্কৃত উচ্চারণে এই সুবিধাটা আছে বলেই কবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যের শেষদিকে সীতা উদ্ধার করে রামচন্দ্র যখন আকাশপথে ফিরছেন, সমুদ্রের তটভূমির বিশাল ব্যাপ্তি বোঝাতে একের পর এক দীর্ঘস্বর ব্যবহার করে শ্লোক রচনা করেছেন। বাংলায় তার সঠিক উচ্চারণটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, আগে মানেটা বলে নিই—'ওই দূরে, বহু দূরে, অনেক নীচে একেবারে ক্ষীণ রেখার মতো লবণাক্ত জলের গোলাকার যে তটভূমি দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকাও। তমাল আর তালবনের মাথায় তটভূমি নীল, একেবারে গাঢ় নীল।' এরপর গোরুর গাড়ির চাকার একটা উপমা। শ্লোকটা দীর্ঘস্বর টেনে উচ্চারণ করে দেখাই—

'দূ—রা—দয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—তমা—লতা—লী—বনরা—জিনী—লা—।
আ—ভা—তি বে—লা—লবণা—ম্বুরা—শে—র্দ্ধা—রা—নিবদ্ধে—ব
কলঙ্করে—খা—।।'

বাংলায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ উচ্চারণে নেই, সেটা কবি জীবনানন্দ দাশের হয়তো মনে ছিল না, থাকলে তাঁর একটা বিখ্যাত কবিতার এই অংশটা কেমন দাঁড়াত—কী বিশাল ব্যাপ্তি বোঝানো যেত, ভাবলেই অবাক হতে হয়। যে উচ্চারণটা সম্ভবত কবির কানে ছিল, সেটা এরকম হতেও পারে—

'চুল তা—র কবে—কা—র অন্ধকা—র বিদিশা—র নিশা—'

কিন্তু কিছু করার নেই, বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণে এটা আসে না।

এবারে ইংরেজি ছন্দের কথা। বাংলা ছন্দের মতো এক-এক ঝোঁকে ঠিক একই সময় ধরে উচ্চারণের দায়ও ইংরেজি কবিতার নেই, আর এইরকম ঝোঁক আলাদা করে কবিদের তৈরিও করতে হয় না। প্রত্যেকটি ইংরেজি শব্দে কোথায় ঝোঁক পড়বে তা নির্দিষ্ট হয়েই আছে, কবি শুধু সেই বিশেষ যে-জায়গায় ঝোঁক পড়াটা তাঁর পছন্দ সেইরকম শব্দ বেছে নেন। শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে এমন শব্দ যেমন ইংরেজি ভাষায় আছে—B'eautiful, P'ardon, C'lass প্রভৃতি যার উদাহরণ, তেমনি অন্য কোথাও ঝোঁক পড়ে এমন শব্দও বহু আছে, যথা—Del'icious, Imp'ortant, Syll'able প্রভৃতি। সুতরাং বাংলা ছন্দের সমস্যাটা ইংরেজির নেই। তো তাহলে, বাংলা ছন্দের মূল ব্যাপার যদি হয় ওই নিয়মিত সময় অন্তর ঝোঁক পড়াটাই—হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম যদি তার স্বরগুলির সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হয়, শব্দের মাঝখানে থেকে ঝোঁক তৈরি করার কোনো সুযোগই যদি আমাদের না থাকে, তবে ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনারও বিশেষ কোনো দরকার বোধ হয় বাংলায় ছন্দে নেই, বরং যেটা বেশি দরকার সেটা হল, ছন্দ যে শিখছে তাকে বেশি করে কানের ওপর নির্ভর করতে শেখানো।

কানের ওপর নির্ভর করতে গেলেই কিন্তু আমাদের উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে। ভাষাতত্ত্বের কোনো পণ্ডিতমশাই যদি এসে বলেন, আরে উচ্চারণগুলোকে বিকৃত করছ কেন? তাহলে বলতে হবে পণ্ডিতমশাই, জন্ম থেকে ওইরকম উচ্চারণ করতেই আমরা শিখেছি। আর ঠিক যেমন করে উচ্চারণ করি তেমন করে না পড়লে ছন্দটাই যে ঠিক থাকবে না, কারণ বাংলা উচ্চারণটাই তো বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য। উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাহলে মনে করে নিই একটু! না, একসঙ্গে রাশি রাশি বৈশিষ্ট্যের কথা বলে কোনো লাভ নেই, ছন্দ শিখতে গেলে যেগুলো না জানলেই নয়, সেগুলোই বলি :

এক।। বাংলা হরফে যেমন-যেমন লিখছ, উচ্চারণ করতে গিয়ে ঠিক তেমন-তেমন পড়ছ না, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ব্যাপারটা এমনিতে ভারি মজার, যেমন ধরো 'অ'-এর উচ্চারণ কিংবা 'এ'-র উচ্চারণ। লিখছ 'অতি', পড়ছ, 'ওতি' ; লিখছ 'এক', পড়ছ 'অ্যাক', কিংবা 'অ্যাকটা' (একটা)—অথচ যেই লিখলে 'একটি', তখুনি 'এ'-র উচ্চারণটা ফিরে এল। আমরা অবশ্য সেই মজাটা এখন তেমন উপভোগ করব না, কারণ ছন্দের ক্ষেত্রে এগুলো বিশেষ কোনো সমস্যা তৈরি করে না; যেগুলো করে সেগুলোকেই চিনে নেবার চেষ্টা করব। সেগুলো কীরকম? যেমন ধরো—আহ্বান, রাক্ষস, উহ্য, লক্ষ্মী, মনোবাঞ্ছা, কঞ্চি, জ্ঞান, যোগ্য, উদ্যান, ব্যক্তি প্রভৃতি।

প্রথম শব্দটার উচ্চারণ কেউ কেউ ভুল করে সত্যি কথা, কিন্তু ওর ঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে **'আওভান'**। পরের শব্দটা হিন্দি ভাষায় ঠিক ঠিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু আমরা উচ্চারণ করি 'রাক্‌খোস'। এইভাবে যদি বাকি শব্দগুলোর উচ্চারণগুলো লিখি, তাহলে সেগুলো হবে যথাক্রমে—উজ্‌ঝো, লোক্‌খি, মনোবান্‌ছা, কোন্‌চি, গ্যান, যোগ্‌গো, উদ্‌দান, বেক্‌তি।

দুই।। বাংলায় বিসর্গ (ঃ)-এর উচ্চারণটা বেশির ভাগ সময়ই বিসর্গের পরে যে ব্যঞ্জনবর্ণটা

আছে, ঠিক তার মতো দাঁড়ায়, মানে আমরা সেইরকম উচ্চারণই করি আর কি। করি কি না দেখো—

লিখি	পড়ি
দুঃসাহস	দুস্‌সাহস
দুঃখ	দুক্‌খ (ক্‌-তো খ-এর মতোই প্রায়)
নিঃশব্দ	নিশ্‌শব্দ
নিঃসন্দেহ	নিস্‌সন্দেহ

তিন।। যে-কোনো বাংলা শব্দে শেষের অক্ষরটা যদি অ-কারান্ত হয়, আমরা সেটা প্রায়ই অ-কারান্ত হিসেবে উচ্চারণ করি না, করি হসন্ত দিয়ে। যেমন—'যেমন' (উচ্চারণ করি য্যামন্‌), 'মন' (উচ্চারণ মোন্‌), দিন (উচ্চারণ দিন্‌), রাত (উচ্চারণ রাত্‌)।

ব্যাপারটা আরও মজার হয় যখন তিন অক্ষরের শব্দে তিনটেই থাকে অ-কার। তখন প্রথম অ-টার উচ্চারণ হয় 'অ'-এরই মতো, দ্বিতীয়টার উচ্চারণ হয় 'ও'-কার, আর তৃতীয়টার উচ্চারণ হয়ই না। কীরকম? দেখো—

লিখি	পড়ি
যখন	যখোন্‌
স্বপন	স্বপোন্‌
রতন	রতোন্‌
গঠন	গঠোন্‌
সকল	সকোল্‌
কথক	কথোক্‌
সরস	সরোস্‌

চার।। শব্দের শেষে যদি অ-কারান্ত অক্ষর থাকে তবে প্রায়ই সেটা উচ্চারণ হয় না, এটা তো আমরা দেখলামই, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা মজার ব্যাপারও লক্ষ করতে হবে—সেই শব্দটার সঙ্গেই যদি আর-একটা শব্দ যোগ করার ফলে সেটা সমাসবদ্ধ পদ হয়ে যায়, তখন কিন্তু ওই অ-কারটার উচ্চারণ হবে, আর সেটা হসন্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না। দেখাই যাক ব্যাপারটা কেমন।

এমনিতে 'জন' শব্দটা আমরা উচ্চারণ করছি—'জন্‌'। এবার 'জন' এর সঙ্গে একটা 'গণ' যোগ করে তৈরি করো আর-একটা শব্দ 'জনগণ'। তখন উচ্চারণ করব এটা—জনোগণ্‌।

আবার আলাদা করে 'গণ' শব্দটাকে দেখা যাক, উচ্চারণ 'গণ্‌'। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ করি 'সংগীত', শব্দটা হল—গণসংগীত, উচ্চারণ—'গণোসংগীত'।

পাঁচ।। আমাদের শরীরের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে অলস হচ্ছে জিভ, ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে আর ছাড়তে চায় না। একটা শব্দে যদি স্বরধ্বনির পরই একটা যুক্তব্যঞ্জন থাকে, জিভ

অনেক সময়ই সেটা একেবারে উচ্চারণ করতে পারে না, সেই যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটাকে বাড়তি উচ্চারণ করে একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর যুক্তব্যঞ্জনটা উচ্চারণ করে। কথাটা স্পষ্ট হবে দু—একটা উদাহরণ শোনালে। ধরা যাক, শব্দটা 'বিক্রয়'—প্রথমে একটা হ্রস্ব-ই আছে, তারপরই যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ + র্'। জিভ করে কী, ওই প্রথম ব্যঞ্জন আর একটা আমদানি করে, সেখানে গিয়ে একটু জিরোয়, তারপর শব্দটা উচ্চারণ করে—বিক্‌ক্রয়। ঠিক এই ভাবেই 'অপ্রিয়', 'অভিনেত্রী', 'অগ্রণী', শব্দগুলিকে আমরা উচ্চারণ করি যথাক্রমে 'অপ্‌প্রিয়', 'অভিনেত্‌ত্রী', 'অগ্‌গ্রণী' প্রভৃতি।

ছয়।। 'ই' আর 'ও'-কারকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব ঝামেলা বাধান তাঁরা, যাঁরা কানকে একটু হেয় করে দেখেন চোখের চেয়ে। ধরা যাক লেখা আছে 'কোনোদিনই' বা 'ঠিকঠিকই', তাঁরা অক্ষর বেড়ে গেলে মনে করে ছন্দভঙ্গের ভয় করেন। আসলে এদের উচ্চারণ তো হবে 'কোনোদিনি' বা 'ঠিকঠিকি'। কবিতার লাইন হিসেবে লিখে দেখো—

বলেছিস ঠিকঠিকই,
তাই ডাকে টিকটিকি।

সেইরকম 'কোনোদিনও' উচ্চারণে 'কোনোদিনো'-ই হয়ে যায়। কাজেই কী শুনলাম সেটাই হল আসল ব্যাপার, কী পড়লাম সে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

কণ্ঠস্বর ভালো রাখতে যা মনে রাখা দরকার

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক।। চলন্ত ট্রামে বাসে কি ট্রেনে কথা না বলা। কোনো শব্দময় স্থানে কথা বলে কাউকে তা শোনাতে চাইলে প্রয়োজন পড়ে বেশ জোরে কথা বলার, যা তখন কণ্ঠস্বরের ক্ষতি করে। ধরুন, আপনি হাওড়া স্টেশনে কাউকে 'সী অফ' করতে গেছেন। সেখানে তখন আপনাকে নানাজনের সঙ্গে কথা বলতে হল। এ দেশের রেল স্টেশনগুলির পরিবেশ সাধারণতই খুব শব্দময় হয়। যে শব্দের নাম 'Ambient Noise'। সেখানে তখন সবাইকে শুনতে এবং শোনাতে আপনাকেই যথেষ্টই বেগ পেতে হল। কিন্তু আপনি তা করলেন আপনার প্রায় অজান্তেই। এরপর স্টেশনের বাইরে এসে, অনেক কম শব্দময় স্থানে পৌঁছে, আপনি বুঝতে পারলেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে গলাটাকে তখন আপনি কতটা ক্লান্ত করেছিলেন। তাই যারা কণ্ঠশিল্পী তাদের উচিত কোনো শব্দময় স্থানে মোটেই বেশি কথা না বলা। অল্প কিছুক্ষণ, এক-আধদিন গলার অপব্যবহার করলে কণ্ঠস্বরে অবশ্যই তেমন ক্ষতি হবার কথা নয়, কিন্তু নিত্য অমন অপব্যবহার হলে, স্বরযন্ত্রে তখন নানান অসুখ হবেই। যা হকার, ভেন্ডাররা অমন সব অসুখে খুবই ভোগেন। যাঁরা ট্রেনের কামরায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁরা বেশি দিন সুরে গান গাইতেও পারেন না।

দুই।। শব্দ-দূষণের মধ্যে যাঁরা বসবাস করেন, জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের কণ্ঠস্বরেরও একই পরিণাম হয়। যথার্থ 'অ্যাকাউসটিক্স' -এর অভাবজনিত প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত যাঁরা নাটক করেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত হন অমন সব অসুখে। আগে আমাদের দেশের অধিকাংশ নাট্যশালাই ছিল অমন ধরনের। তার ওপর তখন শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায়, ঘর ঠাণ্ডা রাখতে অজস্র পাখা চলত। ফলে দর্শকদের শোনাতে, শিল্পীদের প্রচুর চিৎকার করতে হত। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের সুললিত কণ্ঠস্বরটি হারিয়ে ফেলতেন। এখনকার শিল্পীদেরও ওইরকম কোনো হল্-এ পারফর্ম করতে যেতে হয় মাঝে মধ্যে। কিন্তু এদেশের সব প্রেক্ষাগৃহই তো আর রবীন্দ্রসদন বা কলামন্দির নয়। তাই তাঁদের উচিত, হল প্রকৃত অর্থে অ্যাকাউটিক্স -সম্মত না হলে সেখানে টানা কাজ না করা।

তিন।। শিল্পীরা গ্রিনরুমের দূষণের কারণেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। যেসব গ্রিনরুম আলো-হাওয়া যুক্ত নয়, যেখানে 'ক্রস ভেন্টিলেশন' নেই, গ্রিনরুমে অজস্র আলো জ্বলে, তাদের মধ্যকার আর্দ্রতা খুবই কম হয়। ইলেকট্রিক বাল্বগুলি যথেষ্টই উত্তাপের যোগান দেয়, যা তখন গ্রিনরুমের মধ্যকার বায়ুর আর্দ্রতাকে শুষে নেয়। ফলে, গ্রিনরুমের ভেতরের পরিবেশ তখন হয়ে পড়ে আর্দ্রতাহীন, বিশুষ্ক। তার মধ্যে আবার চলে ধূমপান। সব মিলেমিশে

এমন সব গ্রিনরুমের ভেতরকার হাওয়া তখন হয়ে ওঠে যথেষ্টই অস্বাস্থ্যকর। তেমন গ্রিনরুমে যেসব শিল্পীদের দীর্ঘসময় আটকে থাকতে হয়, তাঁরা অচিরেই নানান অসুখের শিকার হন। যেমন, সাইনোসাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি, যারা কণ্ঠস্বরের চরম ক্ষতিকারক। সুখের কথা, হালফিলের নির্মিত অপেরা হাউসের গ্রিনরুমগুলি যথেষ্টই স্বাস্থ্যসম্মত।

চার ।। ধূমপান বা অন্য নানান নেশা যেমন খৈনি, পানমশলা, গাঁজা, জর্দা, মদ ইত্যাদিও গলার ক্ষতি করে। শিল্পকর্মে দীর্ঘকাল টিকে থাকার জন্য তাই অমন নেশাগুলির খপ্পরে না পড়াই ভাল।

পাঁচ ।। কম জলপান করাও গলা ধরার একটা বড় কারণ হতে পারে। জল হল শরীরের প্রয়োজনে পেট্রল বা মোবিলের মতন। গাড়ি যেমন পেট্রল বা মোবিল ছাড়া চলে না, শরীরও তেমনি জল ছাড়া চলতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের উচিত দিনে কমপক্ষে ১০-১২ গ্লাস জল পান করা। শরীরে সঠিক পরিমাণে জল মজুত থাকলে, গলবিলে তখন একটা ভিজে ভাব থাকবে। গলবিলের ঝিল্লীর আবরণ থাকবে কণ্ঠস্বর প্রয়োগের জন্য সঠিক, উপযুক্ত। গলবিলের শুকনো ঝিল্লীর পক্ষে সঠিক কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করাটা প্রায় অসম্ভব। যখন কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করতে শিল্পী বেগ পান, তাঁকে তখন বারবার গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হয়। মনে রাখবেন, রোজ নিয়ম করে ১০-১২ গ্লাস জলপান করা কিন্তু শক্ত ব্যাপার। তাই উচিত জলপান করার জন্য একটি সঠিক নিয়ম মেনে চলা।

যেমন—

সকালবেলা খালি পেটে—	২ গ্লাস
প্রাতরাশে—	২ গ্লাস
দু ঘন্টা পরে—	১ গ্লাস
মধ্যাহ্নভোজন করে—	২ গ্লাস
টিফিনে—	১ গ্লাস
সন্ধ্যায়—	১ গ্লাস
নৈশ আহারের পরে—	২ গ্লাস
শোবার আগে—	১ গ্লাস
মোট—	১২ গ্লাস

ছয় ।। ভোজনে অসাবধান হলেও কণ্ঠস্বর ব্যাহত হতে পারে। শিল্পীর এমন কিছু খাওয়া উচিত নয় যা অ্যাসিড প্রদায়ী। আর অম্বল হচ্ছে এমন মনে হলে তক্ষুনি উচিত তার প্রতিবিধান করা।

গ্রিনরুমে শিল্পীদের সাধারণতই যা খেতে দেওয়া হয় তার অধিকাংশই পেটের পক্ষে যথেষ্টই উত্তেজক। যেমন, রোল, প্যাটিস, সিঙ্গাড়া, ফ্রাই, চপ ইত্যাদি—যা কণ্ঠশিল্পীদের